Vol. 58 | No. 3 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দোভাষী পুথি সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দৃষ্টিভঙ্গি: ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	June 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.2
Pages	১৭-৩৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দোভাষী পুথি সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দৃষ্টিভঙ্গি: ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

Check for updates

মোহাম্মদ আজম

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ১৭-৩৯
DOI 10.62328/sp.v58i3.2

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দোভাষী পুথি সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দৃষ্টিভঙ্গি: ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ: দোভাষী পুথি ও এর ভাষারূপ সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের রচনায় সাধারণভাবে নেতিবাচক ও বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাববিস্তারী লেখাপত্রে তাঁকে যেভাবে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাতে এ নেতিবাচকতা ও বিরূপতা খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু আত্মপরিচয়-সূত্রে সাহিত্যবিশারদ 'মুসলমান' ও 'বাঙালি মুসলমান' পরিচয় এত বেশি ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর যাবতীয় তৎপরতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সে পরিচয়ের প্রত্যক্ষতা এত প্রগাঢ় যে, নিছক 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' পরিচয়ের ভিত্তিতে দোভাষী পুথি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সন্তোষজনক বিশ্লেষণ জুতসই হয় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যবিশারদের রচনাবলি ও তৎপরতার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিই উক্ত সাহিত্যধারা ও ভাষারূপের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। দাবি করা হয়েছে, মতাদর্শিক অবস্থান নয়, বরং স্থান-কালগত গভীর বাস্তবতাই ব্যক্তিপ্রতিভার নিয়ামক হিসেবে কার্যকর হয়েছে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) পুরনো পুথি নিয়ে কাজ করতেন। 'পুথি' কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক, এর একটা স্থির-নির্দিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়েছে: পুরনো সাহিত্যের হাতে লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। এ অর্থেই 'পুথি' কথাটা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যাক, তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর পরিচিতি নিয়ে প্রকাশিত আহমদ শরীফ সম্পাদিত *পুঁথি-পরিচিতি* গ্রন্থে শব্দটি ['পুঁথি' বানানভেদ মাত্র] এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু 'পুথি' শব্দের আরেকটি অর্থও বাংলা সাহিত্য ও ভাষার আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত আছে। 'দোভাষী পুথি'র 'পুথি' কথাটার সাথে পূর্বোক্ত অর্থের ফারাক সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 'দোভাষী' বলতে সাধারণভাবে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিকশিত একটি রচনারীতি ও ভাষারূপ বোঝায়। বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরাই প্রধানত এ ভাষারীতি ব্যবহার করতেন। হাতে লেখা পুথির জগতে এর উদ্ভব হলেও বিকাশ ঘটেছে মুখ্যত কলকাতার ছাপাখানায়। একসময় এ ধরনের রচনা বোঝাতে ব্যাপকভাবে 'বটতলার পুথি' ও 'পুথিসাহিত্য' নাম দুটি ব্যবহৃত হতো (মোহাম্মদ আজম, ২০২২: ১৭৯-৮০)।

উপরে বর্ণিত 'পুথি' শব্দের দুই ব্যবহার পরিষ্কারভাবে আলাদা হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ পার্থক্য সবসময় বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। যেমন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯৯৪:

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১) সাহিত্যবিশারদের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে শুরুতে যেসব পুথির নাম নিয়েছেন, সেগুলো মুখ্যত 'দোভাষী পুথি'; সাহিত্যবিশারদ যে-ধরনের পুথি নিয়ে কাজ করতেন, তার ক্ষেত্রে ওই নামগুলোর বেশিরভাগই প্রযোজ্য নয়। আজরফ অবশ্য বলেছেন, পুথিগুলো তিনি ছেলেবেলায় তাঁর মাকে পড়তে দেখেছেন; কিন্তু ওই বইগুলো যে সাহিত্যবিশারদের কাজের এলাকায় পড়ে না, সে কথা বলেননি। খোদ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও প্রায় একই ভঙ্গিতে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম জিলা সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হিসেবে তিনি যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তা 'প্রাচীন মুসলিম বঙ্গ-সাহিত্য' নামে ছাপা হয় *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪০ সংখ্যায়। এ প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি (১৯৯৪: ১৭২) লিখেছেন:

> বঙ্গদেশের হিন্দুর মত এদেশে মুসলমানদেরও একটা বিরাট প্রাচীন সাহিত্য আছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, এ সাহিত্যের ভিত্তি সুদৃঢ়। আমাদের এই সাহিত্য পল্লীর নিভৃত নিকেতনে, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমান পরিবারগুলিতে এযাবৎ অযত্নেরক্ষিত হইয়া কাল, কীট ও হুতাশনের আহার যোগাইয়া আসিয়াছে। মাত্র অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই সাহিত্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে যে-ভাবে বিবাহসভায়, উৎসববাসরে, বা কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে, বিশ্রাম-ভবনে পঠিত ও আলোচিত হইত, কালের কুটিলগতিতে আজ আর সে অবস্থা নাই।

উপরের বর্ণনার প্রথমাংশে যে সাহিত্যের কথা বলা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে পুরনো হাতে লেখা পুথি। কিন্তু 'মাত্র অর্ধ শতাব্দী পূর্বে' ব্যাপকভাবে পঠিত যে-'সাহিত্যে'র কথা বলা হয়েছে, তা বটতলার ছাপা-পুথি ভিন্ন আর কিছু হতেই পারে না। তার মধ্যেও আবার একটা বড় অংশ নিশ্চয়ই ছিল দোভাষী পুথি। কাজেই বলা যায়, সাহিত্যবিশারদ এখানে পুথি ও দোভাষী পুথির পার্থক্য রক্ষা করে বর্ণনাটা করেননি।

বটতলায় অবশ্য কেবল দোভাষী পুথিই ছাপা হতো না, পুরনো কাব্য-কাহিনিও সেখানে বিপুল পরিমাণে মুদ্রিত হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদসহ যাঁরা পুরনো মুসলমানি সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই পুরনো কাব্যাদির বটতলা-সংস্করণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, শমশের আলীর কাব্য রিজওয়ান শাহ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৯৩৫: ৭১) লিখেছেন: 'এই কাব্যের কোন হস্তলিখিত পুখী আমাদের নিকট নাই। বটতলার মুদ্রিত পুখীই আমাদের আদর্শ। হতভাগ্য বটতলার মুদ্রাকরের কারসাজীতে এই সুন্দর পুথীখানির যে চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি ইহার উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই।' কাজেই বটতলায় ছাপানো মুসলমান-রচিত পুথিমাত্রই দোভাষী পুথি নয়।

উপরের আলাপকে ভিত্তি করে বলা যায়, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কাজ করেছেন পুথি নিয়ে, দোভাষী পুথি নয়। দোভাষী পুথি নিয়ে নানামাত্রিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল সাহিত্যবিশারদ কাজ শুরু করার কিছুটা পরে। সাহিত্যবিশারদ, বলা যায়, ওই তৎপরতাকে মোটামুটি এড়িয়েই গেছেন। কিন্তু যেখানে তাঁর নিজের চর্চার এলাকায় ঢুকে পড়ার কারণে তাঁকে দোভাষী পুথি বা বটতলার পুথি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হয়েছে,

সেখানে সাধারণভাবে তাঁর বিরূপতাই প্রকাশিত হয়েছে। কোথাও কোথাও এমনকি সেই বিরূপতা বিতৃষ্ণার পর্যায়েও গেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যবিশারদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে আমরা দেখতে চাইব, এই বিরূপতা ও বিতৃষ্ণার কারণ কী, আর তাঁর ক্ষেত্রে বিরাগটা ঠিক কী রূপ নিয়েছিল। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি পর্যালোচনা করে আমরা এর তাৎপর্য বুঝতে চাইব।

২

প্রথমেই দেখা যাক, দোভাষী পুথি সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কী কী মত-মন্তব্য পাওয়া যায়।

মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার পৌষ, ১৩৪৮ সংখ্যায় তিনি ''মুসলমানী বাঙ্গালা' কি?' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। প্রবন্ধটি তিনি লিখেছেন 'জনৈক মুসলমান লেখকে'র এক প্রবন্ধের জবাবে, যেখানে ওই লেখক আলাওল, দৌলত কাজী প্রমুখ লেখকের ভাষাকে 'মুসলমানি বাংলা'র কাতারে ফেলেছিলেন। জবাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৯৯৭: ৫৩০-৩৫) মুসলমানি বাংলার যে রূপ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তাতে বোঝা যায়, তিনি আসলে দোভাষী পুথির ভাষাকেই এ নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন। উল্লেখ্য, দোভাষী পুথির ভাষাকে 'মুসলমানি বাংলা' বলার রেওয়াজ সেকালে যথেষ্ট চালু ছিল।

তবে সাহিত্যবিশারদ মুসলমানি বাংলা বা দোভাষী-রীতির রচনা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তিনি আদতে একে আলাপের যোগ্যই মনে করতেন না। এমনকি কথিত 'মুসলমানি বাংলা'র চর্চাকেন্দ্র বটতলা সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব ছিল খুব নেতিবাচক। *মাসিক মোহাম্মদী*তে ১৩৪৮-৪৯ সালে কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রবন্ধ 'আলাওল-চরিত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ। লেখাগুলো ২৪ পরগণা-নিবাসী ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর আলাওল-বিষয়ক নিবন্ধের জবাবে লেখা। আবদুল গফুর সিদ্দিকীর বরাত ছিল বটতলার পুথি। এ উপলক্ষে সাহিত্যবিশারদ বটতলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন (১৯৯৭: ৩০৯): '... বটতলা একটা স্বাধীন রাজ্য। সেখানে বসিয়া পুথির প্রকাশকেরা মনের সাধে যাহা তাহা করে; কেহ তাহাদিগকে ঘাঁটিতে যায় না — যাওয়ার কোন প্রয়োজনও এ পর্যন্ত কেহ মনে করে নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের দুই একজন লেখক বটতলায় প্রচারিত কোন কোন কথা লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমাকেও বাধ্য হইয়া এখানে কয়েকটি কথা বলিতে হইল।'

সওগাত পত্রিকার কার্তিক, ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গলার প্রাচীন মুসলমান কবি' প্রবন্ধে তিনি (১৯৯৭: ৪২৩-২৪) লিখেছেন:

> বটতলায় ছাপা বহু সংখ্যক প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়, যাহা অবলম্বন করিয়া আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন সাহিত্যালোচনা করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারেন। আমি আগে হইতেই তাঁহাদিগকে সতর্ক করিতে চাহি যে, *বটতলার ছাপা পুথির উপর একটি কানা-কড়ির মূল্য বা রতি প্রমাণ শ্রদ্ধা অর্পণ করাও কাহারও উচিত নহে।*

> *বটতলার প্রকাশকেরা একেত বিদ্যাবুদ্ধি শূন্য লোক, তার উপর তাহারা ব্যবসাদার। তাহাদের ছাপা পুথিতে রচয়িতার রচনার মৌলিকতা প্রায়ই রক্ষিত হয় নাই বলিলেও চলে।...*
>
> আর একটা কথা, বটতলার সাহিত্যই সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য নহে। উহার বেশীর ভাগ পশ্চিম বাঙ্গালার দোভাষী বাঙ্গালায় লিখিত। দোভাষী বাঙ্গালার সাহিত্যে সাহিত্যিক মূল্য ও মর্যাদা পাইতে পারে, এমন রচনা বড় বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। [বাঁকা হরফ সংযোজিত]

দেখা যাচ্ছে, বটতলার পুথির প্রতি সাহিত্যবিশারদের নানা ধরনের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল। তাঁর বা তাঁদের জগতের সাথে এর সম্পর্ক ছিল স্পষ্টতই বৈপরীত্যের। বটতলার জগৎ সমসাময়িকতার জগৎ, আর এর সাথে বিপুল পাঠক ও তদনুযায়ী ব্যবসার সম্পর্ক ছিল। সাহিত্যবিশারদ যে-পুথির চর্চা করতেন, তাতে কেবল প্রাচীনত্বই প্রধান নয়, বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের ধরনের দিক থেকেও তার চর্চা সম্পূর্ণ আলাদা। তদুপরি, বটতলার বিরুদ্ধে ভুলভাল ও দায়িত্বহীন ছাপা এবং পুরনো পুথিপত্র নানানভাবে আত্মসাৎ ও বিকৃত করার ভয়াবহ অভিযোগ তো ছিলই। বটতলায় ছাপা *পদ্মাবতী* পড়ে একসময় তাঁর ধারণা হয়েছিল, এ বইয়ের বয়স বড়জোর একশ বছর; কিন্তু পরে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পড়ে বুঝতে পারেন, এ কাব্য আরো অনেক আগের (মুহম্মদ এনামুল, ১৯৬৯ :৭১; আশরাফ, ২০১১: ২১৫)। দায়িত্বহীন ও ভুল ছাপা প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে *আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* বইতে: ‘কবি মোহম্মদ আকবর তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণটি লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই চমৎকার ও উপভোগ্য। দুঃখের বিষয় বটতলার ছাপা পুথীতে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া, কোথা হইতে অন্য একটি বন্দনা সংযোজিত হইয়াছে।’ (মুহম্মদ এনামুল ও আবদুল করিম, ১৯৩৫: ৮২)

সাহিত্যবিশারদ সম্ভবত অধিক হারে এ ধরনের উদাহরণের মুখোমুখি হচ্ছিলেন উনিশশ বিশের দশক থেকে, যখন বটতলার দোভাষী পুথি নিয়ে কেউ কেউ কাজ করতে শুরু করেছিলেন, আর মুসলমান ও হিন্দু সমাজের অনেকে সে কাজকে মুসলমান-রচিত প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্যকর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে ক্রমশ তাঁর প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হচ্ছিল। আগের দিকের লেখায় দুই-একবার একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিরও দেখা মেলে। ‘চট্টগ্রামের সাহিত্য’ প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল *ভারতবর্ষ* পত্রিকার মাঘ, ১৩২৫ সংখ্যায়। এ প্রবন্ধে বটতলার পুথির প্রতি সাহিত্যবিশারদের কোনো বিরূপ মনোভাবের পরিচয় নাই; আবদুল গফুর সিদ্দিকী সম্পর্কেও তাঁর ধারণা অনুকূল ছিল। এখানে সিদ্দিকীর প্রবন্ধ থেকে লম্বা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বটতলার পুথিকেই বাঙালি মুসলমানের ভরসা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সিদ্দিকী বটতলার মুসলমানি সাহিত্যকে কদর না করার অভিযোগে শিক্ষিত মুসলমানদের যে-সমালোচনা করেছিলেন, সে কথা উদ্ধৃতির মাধ্যমে সাহিত্যবিশারদও কবুল করেছেন। তদুপরি সিদ্দিকীর প্রবন্ধ থেকে তিনি মুসলমান কবিদের মোট ৮৩২৫টি পুস্তকের ওই বিখ্যাত ও বিতর্কিত হিসাবটিও গ্রহণ করেছেন। (আবদুল করিম ১৯৯৭: ৫৮৪)

তবে সাহিত্যবিশারদের প্রধান বিরূপতা ছিল দোভাষী পুথির ভাষা বা কথিত 'মুসলমানি বাংলা' নিয়ে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান' [*আল্-এসলাম,* আশ্বিন ১৩২৫] প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন 'মুসলমান সাহিত্য' নিয়ে। কিন্তু দোভাষী পুথি-যে তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেকথা আলাদা টীকা যোগ করে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন (১৯৯৭: ১৬২) : ''মুসলমান সাহিত্য' বলিতে আমরা 'দোভাষী মুসলমান সাহিত্যের' কথাও বলিলাম, কেহ এরূপ মনে করিবেন না। 'দোভাষী বাঙ্গালা' কোন শিক্ষিত ভাষা নহে। সুতরাং তাহাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাও অন্যায়।'

দোভাষী পুথি বিষয়ে সাহিত্যবিশারদের প্রধান আপত্তি, দেখা যাচ্ছে, দু-দিক থেকে। একদিকে এ ভাষা মিশ্র, ফলে অগ্রহণযোগ্য; অন্যদিকে এ ভাষায় কোনো শিল্পসম্মত রচনার দেখা মেলে না। ভাষার প্রশ্নে তাঁর এ অবস্থানের প্রথম জোরালো বিবরণ পাওয়া যায় যৌথ-রচনা *আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* গ্রন্থে: 'পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের উর্দ্দু প্রীতির ফলে এই যুগে তাহাদের বাঙ্গালা ভাষা উর্দ্দু মিশ্রিত হইয়া তাহার স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া ফেলিতে এবং ধীরে ধীরে না-উর্দ্দু না-বাঙ্গালা এমন একটি শক্তিহীন ও দুর্ব্বল জগাখিচুড়ী ভাষায় পরিণত হইতে বাধ্য হয়।' (মুহম্মদ এনামুল ও আবদুল করিম, ১৯৩৫: ৮৯) এরপর লেখকদ্বয় পূর্ববঙ্গের কবি মোহাম্মদ খান ও পশ্চিমবঙ্গের কবি মোহাম্মদ এয়াকুবের কারবালার ঘটনা নিয়ে রচিত দুই কাব্যের সমতুল একাংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন (১৯৩৫: ৮৯-৯০), মোহাম্মদ এয়াকুবের কাব্যে অপ্রয়োজনীয় আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি ঘটেছে, যা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে দীনতা সূচিত করে।

তাঁর এ অবস্থানই আরো জোরালো ও পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে পূর্বোক্ত ''মুসলমানী বাঙ্গালা' কি?' প্রবন্ধে। এখানে প্রকাশিত তাঁর প্রধান সমালোচনাগুলো নিচে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হলো (১৯৯৭: ৫৩৩-৩৪):

এক. 'মুসলমানি বাংলা'য় রচিত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে 'অপাংক্তেয়'। এ ভাষা 'মোল্লা মৌলবীদের মুখে ভিন্ন' মুসলমান-সমাজের আর কোথাও প্রচলিত নয়। কাজেই এ ভাষা ও সাহিত্যকে 'অপাংক্তেয়' করে রাখার চেষ্টা যদি কেউ করে, তবে তাকে অন্যায় বলা যাবে না।

দুই. আলাওল ও দৌলত কাজীর রচনা কিছুতেই এ শ্রেণির সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ যদি একে 'মুসলমানি বাংলা'র সাথে একই পঙ্‌ক্তিতে ফেলতে চায়, তবে ত কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

তিন. 'মুসলমানি বাংলা'র জন্ম হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। 'উর্দু-ঘেঁসা' কতিপয় মোল্লা-মৌলবী 'উর্দুর আবর্জনা' এনে বাংলা সাহিত্যের এই 'দুর্গতি' করেছেন। এখানে উর্দু-ফারসি শব্দের প্রতাপে বাংলা শব্দ 'সংখ্যালঘিষ্ঠে'র ন্যায় 'আড়ষ্টভাবে' বিদ্যমান থাকে। ভাষাটি 'না-বাঙ্গালা না-উর্দু'। এমনকি পশ্চিম বাংলায়ও এটা দৈনন্দিন জীবনের ভাষা নয়।

চার. এই 'খিচুড়ী ভাষা'র অসংখ্য পুথি বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলো খুব জনপ্রিয় হয়েছে। তবে সেগুলো পঠিত হয় 'ভাষার আকর্ষণে নহে', 'প্রধানত বিচিত্র গল্পের মোহে'।

দোভাষী পুথির ভাষা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত বেশ কিছু সিদ্ধান্তের সাথে কলকাতার তৎকালীন প্রভাবশালী ভাবনাচিন্তা, যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (2002[1926]: 211) মতের মিল আছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের রচনায় প্রথমবারের মতো এ মতগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেছে মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে রচিত গ্রন্থে। কাজেই মনে হতে পারে, এসব অবস্থান ও প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর উপর মুহম্মদ এনামুল হকের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আগে-পরের আরো বহু মন্তব্যে প্রায় একই বা সমধর্মী মত পাওয়া যাওয়ায় উপরে বর্ণিত মতগুলোকে সাহিত্যবিশারদের নিজের মত হিসেবে পড়তে কোনো বাধা নেই। তদুপরি, এসব মত-মন্তব্য তাঁর অন্যসব অবস্থানের সাথেও বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। ''মুসলমানী বাঙ্গালা' কি?' প্রবন্ধের পরেও তাঁর অনুরূপ মন্তব্য যথেষ্ট পাওয়া গেছে। ১৯৪৬ সালের এক প্রবন্ধের খবর দিয়েছেন আশরাফ সিদ্দিকী (২০১১: ১৯৯), যেখানে আদমউদ্দীন আহমদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকীসহ দোভাষী পুথির সকল গবেষককেই সাহিত্যবিশারদ 'একচোট' নিয়েছেন। একই বছর ১৫/১২/৪৬ তারিখের এক চিঠিতে আবদুল হক চৌধুরীকে (১৯৯৪: ৮৬) তিনি লিখেছেন, 'আদমউদ্দিনের পুথির ইতিহাস দেখিয়াছি। উহা বাজে কথা। উহার প্রতিবাদ বা আলোচনা করিতে গিয়া উহার মূল্য বাড়ান আমার ইচ্ছা নহে। হাতে খড়ি দিয়াই একেবারে ইতিহাস লিখিয়া ফেলা। সে পুথি সমুদ্রের তটদেশেও যায় নাই। মৌলবী মানুষ দোভাষী বাঙালার তারিফ না করিয়া আর করিবে কি? আমার পুথিগুলি পশ্চিম বাঙ্গালার লোককে দিব না। সে চিন্তা করিও না।'

জোরারোপের হেরফেরে খানিকটা উঠানামা থাকলেও দোভাষী পুথির ভাষা বা মুসলমানি বাংলা সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সিদ্ধান্ত সারাজীবন মোটামুটি একই ছিল — তিনি এ ভাষা ও চর্চাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না।

৩

দোভাষী পুথির চর্চা শুরু হয় আঠার শতকের শেষভাগে। বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর ধরে বহু রচয়িতা এ ধারায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। পরবর্তীকালে বাঙালি মুসলমানের এ রচনাধারার মূল্যায়নে অন্তত দুটি বড় ও পরস্পর-বিরোধী মত লক্ষ করা গেছে। একদিকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা প্রবল হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে সাহিত্যসেবীদের বড় অংশ দোভাষী পুথির ভাষা ও সাহিত্যকে বাঙালি মুসলমানের 'প্রকৃত' ঐতিহ্য হিসেবে পুনর্লিখন শুরু করে। অন্যদিকে, পঞ্চাশের দশক থেকে ঢাকায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও চর্চার প্রবলতার প্রেক্ষাপটে দোভাষী পুথি তথা মুসলমানি বাংলা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় — প্রতিষ্ঠিত হয় অগ্রহণযোগ্য ঐতিহ্য হিসেবে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এ দুই যুগের আগের মানুষ। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মূল্যায়নে তাঁকে সাধারণভাবে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' ধারার মানুষ বলেই গণ্য করা হয়। তিনি বাংলাদেশে জাতীয় 'আইকন' বলেই স্বীকৃত (গৌতম, ২০১১: ৩)। সেলিম আলদীন তাঁর বিখ্যাত নাটক কেরামতমঙ্গল উৎসর্গ করেছেন সাহিত্যবিশারদকে। উৎসর্গপত্রে বলেছেন: 'আধুনিক বাঙালীর আত্মঅন্বেষণে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ আবদুল করিম

সাহিত্যবিশারদ-এর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে।' সাহিত্যবিশারদের রচনাবলি ও স্মারকগ্রন্থের একজন সম্পাদক আবুল আহসান চৌধুরী (২০১১: ভূমিকা) তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে: 'মনে-মতে, চেতনা-বিশ্বাসে সাহিত্যবিশারদ ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিপন্থী, সংস্কারমুক্ত, ঐতিহ্যসন্ধানী, সংস্কৃতিসাধক, মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ এক বিশুদ্ধ বাঙালি।' এ বর্ণনায় ব্যবহৃত বিশেষণগুলো যতই অস্পষ্ট আর অনির্দিষ্ট হোক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পরিচায়ক হিসেবে ওগুলোর ব্যবহার বাংলাদেশে বস্তুত সর্বব্যাপী। আহমদ শরীফ (১৯৮৭) তাঁর ছোট কিন্তু প্রভাবশালী জীবনীগ্রন্থে সাহিত্যবিশারদকে তো বটেই, এমনকি তাঁর পারিবারিক আবহ ও ব্যক্তিগত আচার-বিশ্বাসকেও প্রায় অনুরূপ বিশেষণে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জীবন ও কর্মে এভাবে দেখার উপাদান এত বেশি পাওয়া যায় যে, মূল্যায়নের এই অতি-প্রভাবশালী ধারার ব্যাপারে কোনো কার্যকর আপত্তি উত্থাপন করা চলে না।

তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব কবি ও লিপিকরদের পুথি-সংগ্রহের কাজ করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তাঁর যে-কটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সবগুলোই হিন্দু কবিদের রচনা। সে অবশ্য তাঁর প্রথম জীবনের কথা। পরের জীবনে হিন্দু-কবিদের রচনা নিয়ে তুলনামূলক কম কাজ করলেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একটি অসাম্প্রদায়িক ভাষা ও সাহিত্য শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। *পূর্ণিমা* পত্রিকার পৌষ, ১৩০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'জ্ঞানপ্রদীপ' নামের নিবন্ধে তিনি (১৯৯৭: ৩৭৭) লিখেছিলেন:

> প্রাচীন সাহিত্যালোচনা হইতে আমরা আর একটী তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি যে, প্রাচীন সময়ে একই বৃক্ষের দুইটী শাখাস্বরূপ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সখ্যভাবমিশ্রিত একটা দৃঢ়তর একতাবন্ধন ছিল। এই ভাবের অভিব্যক্তি তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে ত প্রস্ফুট ছিলই, সাহিত্যক্ষেত্রে পর্যন্ত তাহার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।... আমাদের হস্তগত প্রাচীন হস্তলিখিত হিন্দুপুঁথিতে মুসলমান কবির ও মুসলমানী পুঁথিতে হিন্দু কবির কবিতাদি দেখিয়া সেই সুখস্বপ্নময় প্রাচীনকালের পুনরাবির্ভাবের জন্য জগৎপিতার নিকটে কতবারই না সাগ্রহে কাতর প্রার্থনা করিয়াছি।

এই প্রার্থনাকে অসাম্প্রদায়িক বা প্রগতিশীল বা সেকুলার — যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, মৃত্যু অবধি তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ বদল দেখা যায়নি। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার মাঘ, ১৩২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'চট্টগ্রামের সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি (১৯৯৭: ৫৮৫) নতুন আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি না করার অনুরোধ করেছেন, এবং সাহিত্যিক গুরু হিসেবে আলাওলের ভাষা অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রবলতার দিনে সে অবস্থানের খুব একটা বদল হয়নি। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভাষা প্রশ্নে বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনটি বিষয়ে বিতর্ক ছিল — বাংলা মুসলমানের মাতৃভাষা কি না; বাংলা মুসলমানদের জাতীয় ভাষা কি না এবং বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের পরিমাণ কত হবে (আবদুল করিম, ১৯৯৪: ১৮৫)। তিনটি প্রশ্নেই সাহিত্যবিশারদ আমৃত্যু দায়িত্বশীল ও ব্যক্তিত্ববান অবস্থান ঘোষণা করেছেন। বাংলা যে

বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কেবল নয়, জাতীয় ভাষাও — সে বিষয়ে তিনি কস্মিনকালেও সন্দেহে ভোগেননি। আর অকারণে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করে ভাষার স্বাভাবিক গতি রোধ করার ব্যাপারেও তিনি বরাবর কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। এদিক থেকে তাঁর অবস্থান পরবর্তীকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের প্রায় অনুরূপ। এ সূত্রে আমরা বলতেই পারি, যেসব কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্সে দোভাষী পুথি বা মুসলমানি ভাষাকে অগ্রহণযোগ্য ভাবা হয়, তার সবগুলোই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু এরকম ভাবার দুটি বাস্তব অসুবিধা আছে। প্রথমত, সাহিত্যবিশারদ বাংলাদেশ অঞ্চলে পরস্পর প্রতিস্পর্ধী দুটি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা বিকশিত হওয়ার বহু আগের যুগের মানুষ। এতটা ভিন্ন বাস্তবতা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর অবস্থান পরবর্তীকালের বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মতো করে কাজ করেছিল — এমন অনুমান ঠিক ইতিহাসসম্মত হয় না। দ্বিতীয়ত, নিজের অবস্থান ঘোষণার ক্ষেত্রে, নিজেকে কাজে ও মর্মে চেনানোর প্রশ্নে সাহিত্যবিশারদ 'মুসলমান' বা 'বাঙালি মুসলমান' পরিচয় এত বেশি ব্যবহার করেছেন যে, এ প্রশ্ন মোকাবেলা না করে এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই অসঙ্গত হবে।

প্রথমোক্ত প্রসঙ্গটির আলাপ পরের অনুচ্ছেদে বিস্তারিত করব; কারণ, সাহিত্যবিশারদের বাস্তবতা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আংশিক সুলুক সন্ধান করা — যাতে দোভাষী পুথি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিটা বোঝা যায় — বর্তমান রচনার প্রধান লক্ষ্য। আপাতত দ্বিতীয় প্রসঙ্গটির পর্যালোচনা করা যাক।

নিজের কাজের উদ্দেশ্য এবং এলাকার পরিচয় দিতে গিয়ে সাহিত্যবিশারদ সবসময় 'মুসলমান' পরিচয়কেই উচ্চকিত করেছেন। অন্যরাও তাঁকে এ পরিচয়েই দেখেছে, বা দেখতে চেয়েছে। তাঁর নিজের রচনার সম্ভাব্য শত শত উদ্ধৃতি থেকে দু-চারটির উল্লেখ করছি। ১৯৪৫ সালে তাঁর জয়ন্তী উৎসবে প্রদত্ত মানপত্রের জবাবে সাহিত্যবিশারদ বলেছিলেন (উদ্ধৃত, আবদুল করিম, ১৯৯৪: ১১৫):

> হিন্দু পুস্তক পত্রিকা পাঠ করিতে করিতে একটা প্রশ্ন আমার মনে আন্দোলিত হইত যে, আধুনিক কালের মতো প্রাচীন কালেও কি মুসলমানের কোন সাহিত্য ছিল না?... প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিতে করিতে বুঝিতে পারি যে, হিন্দুর মতো মুসলমানেরও একটা বিরাট সুগঠিত ও উন্নত প্রাচীন সাহিত্য আছে। তাহাই প্রমাণ ও প্রদর্শন করিবার জন্য নিজের দারিদ্র্য ও ক্ষুদ্র শক্তি বিস্মৃত হইয়া আমি ধ্যান-মগ্ন যোগীর ন্যায় বিগত সার্ধ শতাব্দীকাল এক ধ্যানে কাটাইয়া আজ ৭৪ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছি।

'রোসাঙ্গ রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' [*মাসিক মোহাম্মদী*, ভাদ্র, ১৩৪১] প্রবন্ধে পাওয়া যায় তাঁর লজ্জা, অপমান ও দুঃখের নিম্নোক্ত কারণ (১৯৯৭: ৫১৮):

> সুদূর অতীতকাল হইতে মুসলমানেরাও হিন্দুর পাশাপাশি বসিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন ও চর্চা করিয়া আসিয়াছেন এবং এক বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

> সেই সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিলে অমৃতের সন্ধান মিলিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া নীলকণ্ঠের মত হিন্দুর সাহিত্য-ইতিহাসের মুসলমানের গ্লানিরূপ হলাহল পান করিতেও আমাদের লজ্জা ও অপমানবোধ নাই! কি দুঃখের কথা!

মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার আষাঢ়, ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রাচীন মুসলিম বঙ্গ-সাহিত্য' প্রবন্ধে [সভাপতির অভিভাষণ, চট্টগ্রাম জিলা সাহিত্য সম্মিলন ১৩৪০] তিনি (১৯৯৪: ১৬৭) লিখেছেন:

> আমার পূর্ণ বিশ্বাস, বাঙ্গালার বর্তমান মুসলমানগণ তাঁহাদের সাহিত্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদিগকে সর্বাগ্রে প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে হইবে এবং ইহার ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

উপরের তিনটি উদ্ধৃতিই অনেক পরের রচনা। কাজেই মনে হতে পারে, প্রভাবশালী স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব এসব মন্তব্যের উপর পড়েছে। সাহিত্যবিশারদ রচনাবলিতে ও সামগ্রিক চর্চায় এহেন প্রভাব আসলেই শনাক্ত করা যায়। কিন্তু তাঁর আলোচ্য অবস্থান যে এর ফল নয়, তার প্রমাণ হিসেবে অনেক আগের একটা নমুনা চয়ন করা যেতে পারে (১৯৯৭: ৪০৯)। 'দৌলত উজীর ও লায়লা মজনু' নামের লেখাটি ছাপা হয়েছিল *নবনূর* পত্রিকার আশ্বিন, ১৩১০ সংখ্যায়:

> ... প্রাচীনকালে হিন্দু-সাহিত্যের মত মুসলমানগণেরও একটা স্বকীয় সাহিত্যের গঠন হইতেছিল।... যত্ন করিলে এখনো তাহার পুনরুজ্জীবনের আশা করা যাইতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু-ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের বিলুপ্ত প্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে ও নব্য সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় নানা সভা সমিতি সংস্থাপিত করিয়া কত চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মুসলমানী সাহিত্যের হিতকল্পে আমাদের কোন রূপ যত্ন ও চেষ্টা মাত্রই নাই ।

আহমদ শরীফ (১৯৬৯: ৯২) সাহিত্যবিশারদের মৃত্যু-পরবর্তী এক মূল্যায়নে তাঁর কৃতিত্বকে সূত্রবদ্ধ করেছেন এভাবে:

> তাঁরই সাধনা ও গবেষণার ফলে বাঙালী জান্‌ল যে, বাংলা সাহিত্যের আদি কবি মুসলমান, বাংলা সাহিত্যের বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্র্য প্রদান করেন মুসলমান কবিগণ, প্রথম মৌলিক কাব্য রচনা করেন মুসলমান কবি মরদন ও মাগন ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে প্রথম শালীনতা দান করেন মুসলমান কবি আলাওল। এক কথায়, তিনিই জানিয়ে দিলেন যে, বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য সাধনের মূলে রয়েছে প্রথমতঃ প্রধানতঃ মুসলমানদের সাধনা।

এই যে সাহিত্যবিশারদ 'আমাদের' কথাটার পুরো আওতা দিব্যি বাঙালি মুসলমান দিয়ে ভরে ফেলেছেন, আবার নিজের 'বাঙালি' পরিচয়কেও কোনো প্রকার ছাড় না দিয়ে আঁকড়ে ধরে থেকেছেন, এটা কিভাবে সম্ভব হলো? বাংলাদেশের প্রভাবশালী ডিসকোর্সে এ দুয়ের

মধ্যে বড় ধরনের বিরোধ দেখা হয়, আর দুয়ের সহাবস্থান সাধারণভাবে সম্ভব মনে করা হয় না। কিন্তু আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের পুরোটা জুড়ে একে কেবল সম্ভবই মনে করেননি, বাস্তবায়নও করেছেন। গৌতম ভদ্র (২০১১: ৩-৫৮) এ দুইয়ের কার্যকর সংশ্লেষের কাঠামোগত সূত্র প্রণয়ন করেছেন।

জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য — কথা দুটির অন্তত ছক ও কাঠামো সাহিত্যবিশারদ তাঁর পূর্বসূরি হিন্দু-পণ্ডিতদের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। এর সাথেই অনিবার্য যোগ জাতীয় জীবনের। উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে শুরু করে বিশ শতকের অন্তত প্রথম দুই দশক পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট চর্চাকারী, যেমন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রমুখের লেখায়-উচ্চারণে 'ভাষা ও জাতিসত্তার সম্পর্কটি সরাসরি উপমার প্রয়োগে ও উপমিতির অনুভবে জমাট বাঁধে ও ফুটে ওঠে' (গৌতম ২০১১: ১৮)। স্পষ্টতই পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুণে এ ধরনের চিন্তাভাবনার আবির্ভাব; আবার পশ্চিমা শাসনের বাস্তবতার মধ্যেই এক ধরনের অস্পষ্ট জাতীয়তাবাদী চিন্তার উৎসারণ। বাস্তবে প্রত্যক্ষ আন্দোলন-সংগ্রাম বা জনমানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই জাতীয়তার আদিকল্পগুলো স্থির হয়নি। কাজেই তাতে নানা অস্পষ্টতা ছিল। এমনকি 'বাঙালি' পরিচয়ের মধ্যেও সম্প্রদায়গততার ছাপ খুব সহজেই বোঝা যায়। ব্যোমকেশ মুস্তফী মুনশি আবদুল করিমের *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের* জন্য ভূমিকা লিখেছিলেন। ওই ভূমিকা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছেন গৌতম ভদ্র (২০১১: ২৫):

> বঙ্গসাহিত্যই বলিয়া দেয়, বাঙ্গালার পাঠান-নৃপতিরা যেমন হিন্দুর দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিতেন, তেমনি আবার হিন্দু দেবদেবীরই মঙ্গল-গীত লেখাইতেন, বাঙ্গালী কবিকে প্রতিপালন করিতেন, শিরোপা দিতেন। মুসলমান-কবিরাও বাঙ্গালা ছন্দে হিন্দুদেবতার লীলা, হিন্দু-সতীর মহিমা, হিন্দু নায়ক-নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিতেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের 'হাদিস' লইয়া সাধকের ভাবে সাধন-গীত গাহিতেন।

এ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যাসূত্রে গৌতম ভদ্র (২০১১: ২৫) লিখেছেন: 'এই সাহিত্যপাঠ তো বাঙালির অখণ্ড জাতীয় ইতিহাস রচনার সমতুল্য। কিন্তু সমন্বয়ের ঝোঁক অবশ্য হিন্দু সংস্কৃতির দাপেই আছে, সেটাই যেন একমাত্র প্রতিমান।'

ঠিক একই কাঠামো দেখি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের যাবতীয় রচনা, অনুভব ও আকুতিতে। অখণ্ড বাঙালি জাতির সামগ্রিক রূপই তিনি চান। কিন্তু জানেন, কোনো এক সম্প্রদায়ের রচনায় তা পাওয়া যাবে না। ফলে তাঁর কাজ হলো, এতকাল ধরে অনাবিষ্কৃত-উপেক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের রচনাদি উন্মোচন করা। তিনি স্পষ্টতই 'মুসলমানি' ভাব ও স্বভাবের সাহিত্যই চান, এমনকি নতুন সাহিত্যিকদের পরামর্শ দিতে গিয়ে তিনি পুরনো মুসলমানি সাহিত্যের প্রসঙ্গ অনুসরণ করতে বলেন, তরুণ লেখকদের লেখায় মুসলমানি ভাবের অনুপস্থিতি দেখে উদ্বিগ্ন হন; কিন্তু এর কোনো বৈশিষ্ট্যই তার উদ্দীষ্ট সাহিত্যকর্মকে 'বাঙালি' কোটা থেকে বিচ্যুত করে না। কারণ, 'বাঙালি' তাঁর কাছে একক কোনো সত্তাই নয়, বরং নানা সত্তার যৌগরূপ।

সাহিত্যচর্চাসহ যাবতীয় তৎপরতায় জাতীয় ভাষা বাংলা আর বৃহত্তর বাঙালি জাতিসত্তার পোষকতাই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবে যে অবস্থার মধ্যে তিনি কাজটা করছেন, তার এ ধরনের কোনো সমন্বিত অস্তিত্ব নাই। পুরনো সাহিত্যে তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের লেখায় মুখ্যত মুসলমান সমাজের কথাই পাচ্ছেন। মুসলমানের ধর্মশাস্ত্রের বিবরণ পাচ্ছেন। আবার সেই অতীত সাহিত্যের বর্তমান চর্চায়ও হিন্দুর ঘর আর মুসলমানের ঘর আলাদা মনে হচ্ছে। তিনি নিজের কাজের পরিচয় দিতে গিয়ে বরাবর বৃহত্তর বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির কথা বলেছেন। কিন্তু সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে একবারের জন্যও হিন্দু-মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বী নির্বিশেষে কোনো উদ্যোগ-আয়োজনের কথা বলেননি। বরাবরই সাহায্য চেয়েছেন মুসলমানদের। এমনকি ব্যক্তিগত কাজকে তিনি যখন সামষ্টিক পরিচয় বা সত্তায় প্রসারিত করতে চাচ্ছেন, তখনো তাঁর আহ্বান মুসলমান সমাজকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর বাঙালি পরিসরে পৌঁছে নাই। তার মানেই হলো, আজকের দিনে আমরা যে অর্থে 'বাঙালি' কথাটা ব্যবহার করি, সাহিত্যবিশারদের ক্ষেত্রে তা মোটেই সে অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে না।

সমকালে বাঙালিত্ব ও মুসলমানত্ব নিয়ে যে প্রবল টানাপড়েন, তার সুরাহা খুব সরল না হলেও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছে তা বড় সমস্যা নয়। পুরানা বাঙালি মুসলমানের ভাষাচর্চা তথা সাহিত্যচর্চার সাক্ষ্যই নিশ্চিত করে বলছে, বাংলা মুসলমানের মাতৃভাষা শুধু নয়, জাতীয় ভাষাও বটে। তিনি নিজে ওই সাহিত্যচর্চার বর্তমান সাক্ষ্য-প্রমাণ তৈরির প্রধান কারিগর। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন এবং বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি-মুসলমান-প্রধান পূর্ব বাংলায় যে নতুন জাতীয় চেতনা বিকশিত হয়েছিল, আবদুল হক (১৯৬৯) সাহিত্যবিশারদকে দেখেছেন তার বুনিয়াদ হিসেবে। তাঁর মতে, বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে সামষ্টিকভাবে দাঁড়ানোর জন্য সমাজে এমন বোধ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে থাকা জরুরি ছিল যে, প্রায় শুরু থেকেই বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছে; আর তার জাতীয় পরিচয় বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। অর্থাৎ, তার মুসলমান পরিচয়ের সাথে বাঙালি পরিচয়ের একটা রফা না হলে এ ঘটনা সম্ভবত ঘটতেই পারত না। আবদুল হকের মতে, এই জাতীয় চেতনা সৃষ্টির পেছনে এককভাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন।

গৌতম ভদ্র (২০১১: ৪৬) যথার্থই বলেছেন:

> আবদুল করিম আদৌ একশেষপন্থী নন, পুথিবিচার ও সংগ্রহের ধারণায় তিনি সমাহার ও ইতরেতরের অনুগামী। বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গে বাংলা পুঁথিবিচারে তিনি সমুদায়ত্বের পক্ষে; বাংলা ভাষা ও ইসলামি তমদ্দুনের সংঘপ্রাধান্যেই পুথিসাহিত্য নির্মিত, অবয়বের সমাবেশত্বই ঐসব পুথির লক্ষণ ।...
>
> বুদ্ধিজীবীরূপে আবদুল করিম সমন্বয়বাদী। 'সম-অন্বয়' শব্দটি একেবারে অভিধার অর্থে বুঝতে হবে। সমভাবে বিন্যস্ত পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি থাকলেই হল। আবদুল করিমের কাছে বাঙালি ও মুসলমানি সত্তার মধ্যে কেবল পারস্পরিক সঙ্গতিই কাম্য। উভয়ের রূপান্তর বা আধুনিক মিশ্রণ তাঁর প্রকল্পের ঝোঁক নয়। নজরুল ইসলাম বা কাজী আবদুল ওদুদের চাইতে মেজাজে তিনি এখানেই আলাদা।

দীনেশচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী চর্চাকারী সবাই হিন্দু-সমাজ থেকে আগত মানুষ হিসেবে হিন্দু-রচিত সাহিত্যের ইতিহাসই লিখছিলেন। তাঁরা মুসলমানদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে

কাজ করেননি কেন? নিশ্চয়ই সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক পরিগঠনের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। অন্যদিকে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যে হিন্দু-সাহিত্যিকদের নিয়েও দেদার কাজ করেছেন, তার উৎসও নিশ্চয়ই সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক। কিন্তু এটাও সত্য, তাঁর প্রধান কৃতিত্ব বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্য উদ্ধার এবং পরিচয়-দান, যা থেকে বাংলা ভাষার বিশ্রুত ঐতিহাসিক ও আলোচকগণ উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এমতাবস্থায় আদর্শ হিসেবে যদি ঊন ও গৌণ মনেও করেন, মুসলমান সমাজের সাহিত্যিক উৎপাদন হিসেবে দোভাষী পুথির প্রতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মনোযোগ থাকার কথা। কারণ তাঁর কর্মকাল শুরুর সময়টায় এ চর্চা মুসলমান সমাজে খুবই তাজা ছিল; আর আগের প্রায় দেড়শ বছর ধরে মুসলমান সমাজে মুখ্যত দোভাষী পুথিই লিখিত হয়েছে। কাজেই নিছক মুসলমান সমাজের উপাদান হিসেবেই এগুলো তাঁর বিবেচনায় আসতে পারত। সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে বা ভাষাগত আদর্শের দিক থেকে তিনি এর বিরূপ সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু দুটি ঘটনা ঘটল সাহিত্যবিশারদের সংশ্লিষ্ট চর্চায়। এক. তিনি দোভাষী পুথির চর্চায় জীবনে একবারের জন্যও লিপ্ত হননি। দুই. তিনি দোভাষী পুথিকে যাবতীয় অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যসহ নাকচ করে দিলেন। কেন এটা ঘটে থাকতে পারে — তার সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ওইকাল সম্পর্কে আমাদের অন্তত আংশিক ধারণা দিতে পারে। অন্যদিকে, ওইকালের বিশেষ পাঠ অনুমান-নির্ভর বিশেষায়ণের বদলে আলোচ্য প্রশ্নে আমাদের বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনায় উন্নীত করতে পারে।

৪.১

উনিশ শতকে ভারতব্যাপী পুথিসংগ্রহ ও তার নানামাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুব জোরালো ও সম্মানজনক চর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তেলুগু ভাষার পুথি-সংগ্রাহক, বৈয়াকরণ ও অভিধান-রচয়িতা চার্লস ফিলিপ ব্রাউন (১৭৯৮-১৮৮৪) ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সংগৃহীত প্রায় আড়াই হাজার পাণ্ডুলিপি মাদ্রাজ লিটারারি সোসাইটিকে দান করেন (গৌতম, ২০১১: ৪; ৪৮)। অন্যদিকে সাহিত্যবিশারদের একেবারেই সমসাময়িক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে সারাজীবন কাটিয়েছেন পুথি-সংগ্রহে আর মারাঠি ভাষায় সংশ্লিষ্ট লেখালেখি করে (গৌতম, ২০১১ : ৪)। ঝোঁক, মতাদর্শে ও বাস্তবতায় নানা অমিল থাকলেও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সামগ্রিক তৎপরতা এর সাথে তুলনীয়।

বৃহত্তর অর্থে প্রাচ্যবিদ্যার বিশাল অঙ্গনের সঙ্গী হয়েই সাহিত্যবিশারদের চর্চার সূত্রপাত। ধ্রুপদি ভাষা-সাহিত্যের চর্চা পেরিয়ে তদ্দিনে স্থানীয় ভাষার উপকরণ-চর্চা একটা কাঠামোগত স্বীকৃতি ও মান্যতা পেয়েছিল। উনিশ শতকের শেষাংশেই ভারতচর্চায় দেবভাষার পরিবর্তে লোকভাষার প্রাধান্য সূচিত হয়। একইসাথে তাত্ত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সে স্বীকৃতির পেছনে গ্রিয়ারসনসহ অন্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের প্রত্যক্ষ মদত ছিল (গৌতম, ২০১১: ১৫-১৬)। কলকাতায় আমরা বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ সময়ে সমধর্মী চর্চার বর্ণাঢ্য

বিকাশ দেখতে পাই । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে সাহিত্যবিশারদের সম্পাদনাকে 'জার্মান এডিটর'-এর সাথে তুলনা করেছিলেন, সে কথার বহু ধরনের পাঠ সম্ভবপর; কিন্তু একটা কথা এ তুলনায় খুব স্পষ্ট যে, পুরো প্রক্রিয়ার একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ মান প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রধান কৃতিত্ব, তিনি ওই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন খুব 'প্রান্ত' থেকে, এবং এমন এক জনগোষ্ঠীর প্রায় একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে, যাদের মধ্যে সমধর্মী কাজের ক্ষীণতম আভাসও আগে ছিল না।

সাহিত্যবিশারদের কৃতি ও কীর্তির মূল্যায়নে এই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবতার কথা ভুলে গেলে চলবে না। শৈশবের পুথি-পড়া আসরে যোগদানের স্মৃতি তাঁকে পরবর্তীকালে পুথি-সংগ্রহের আসরে টেনে নামিয়েছে — নিজের বহু লেখায় এ স্মৃতিচারণ করে নিজের জন্য একটা কার্যকারণ সম্পর্কের কাঠামো দাঁড় করালেও তাকে আক্ষরিক অর্থে নেয়ার কোনো কারণ নাই। সাহিত্যবিশারদ নিঃসন্দেহে একটা প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানজনক চর্চার কাঠামোতেই অংশগ্রহণ করেছিলেন; আর যতই প্রান্তবর্তী হোন না কেন, ওই কাঠামোর সাথে তাঁর প্রয়োজনীয় পরিচয় ছিল এবং বাস্তব তৎপরতা হিসেবে এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি হাজির ছিল।

সাহিত্যবিশারদ নিজেকে দরিদ্র ও প্রান্তীয় বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। নিঃসন্দেহে তাঁর নানামাত্রিক প্রান্তিকতা ছিল; বিশেষত কলকাতা, হিন্দু সম্প্রদায় ইত্যাদির সাপেক্ষে। কিন্তু নিজ এলাকা ও সমকালীন মুসলমান সমাজের বিবেচনায় তিনি বেশ সুবিধাজনক অবস্থানেই ছিলেন। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, আহমদ শরীফ (১৯৮৭: ১৪-১৫) জানাচ্ছেন, তারা সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি চালুর সময় থেকেই পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। ১৮৯৩ সালে আবদুল করিম যখন প্রবেশিকা শেষ করেন, তখন তিনি ছিলেন 'জেলার অর্ধাংশে প্রথম মুসলিম ইংরেজী শিক্ষিত'। অন্যদিকে, লেখাপড়ার চর্চা ছিল বলেই বাড়িতে 'অমুদ্রিত আরবী ফারসী বাঙলা পুঁথি ও বইপত্রের সংগ্রহ ছিল'। পরিবেশের এই আনুকূল্যের কারণে তিনি স্কুল জীবনে হাতে লেখা জটিল 'কলমী পুথি' পড়তে শেখেন। তাঁর পরবর্তী তৎপরতার জন্য এরচেয়ে বড় প্রস্তুতি আর কী হতে পারত?

এ প্রস্তুতির সাথে কলকাতার প্রতিষ্ঠিত নানা অনুশীলনের একটা দূরবর্তী কিন্তু কার্যকর যোগ তৈরি হচ্ছিল শুরু থেকেই। এমনিতেই তখনকার শিক্ষিত পরিসর প্রকৃতপক্ষে হিন্দু পরিসর — জনমিতি আর সংস্কৃতি দু-দিক থেকেই। আর শাসনকেন্দ্র হিসেবে এবং হিন্দু-প্রধান শিক্ষিত শ্রেণির সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা ছিল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। কিশোর আবদুল করিমের সাথে কলকাতার যোগটা গভীরতর হয়েছিল পত্রপত্রিকার সুবাদে। তাঁর একাধিক জীবনীকার জানিয়েছেন, প্রকাশিত সমস্ত পত্রিকা সংগ্রহে রাখা শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর রীতিমতো 'বাতিক' ছিল। কোনো সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, অথচ তাঁর সংগ্রহে নাই, এটা তিনি বরদাশত করতে পারতেন না। অভ্যাসটা শুরু হয়েছিল কিশোর বয়স থেকেই। মোহাম্মদ ইদরিস আলী (১৯৬৯ : ৯৭) লিখেছেন:

> এমন পত্রিকা-পাগল লোক সচরাচর দেখা যায় না।... স্কুলে যখন নবম শ্রেণীতে পড়েন, তখন তিনি একই সঙ্গে গ্রাহক ছিলেন — 'Hope' নামে একখানা ইংরেজী ও 'প্রকৃতি'

> নামে একখানা বাংলা সাপ্তাহিকের এবং আটখানা বাংলা মাসিকের।... আমরা তাঁর মুখে শুনেছি যে এক সময়ে তিনি এক সঙ্গে চল্লিশখানা পত্রিকার গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

ফলে কলকাতার বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার খুব উঁচু মোকামের সাথে তাঁর গভীর পরিচয় তৈরি হয়েছিল পত্র-পত্রিকার সূত্রে। আবার পত্রিকার পাতাই তাঁকে নিজের কর্মপদ্ধতি এবং এমনকি লেখার পদ্ধতি সম্পর্কেও একটা পরিষ্কার ধারণা দিয়েছিল। পত্রিকার নিবন্ধ হয়েছে তাঁর প্রধান প্রকাশ-মাধ্যম। পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত তাঁর বিপুল প্রবন্ধের কাঠামো পরীক্ষা করলেও তাঁর লেখক-মানস সংক্রান্ত ইশারা পাওয়া যাবে। দেখা যাবে, গড়ে ওঠা রেওয়াজ অনুযায়ী পুথির সত্যতা প্রতিপাদন, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যুক্ত করে পুথিটিকে নির্দিষ্ট স্থান-কালের মধ্যে প্রতিস্থাপন আর ভাষিক নমুনা সরবরাহ — এ ক্রমেই তাঁর সমধর্মী প্রবন্ধগুলোর কাঠামো স্থির হয়েছে। অবশ্য, স্থান-কাল-পাত্র আর পত্রিকার অবস্থান-ভেদে ভিন্নতা তো ছিলই।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পর্কিত হয়েছিলেন এক বর্ণাঢ্য একাডেমিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সাথে। প্রাচ্যবিদ্যার আবহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান সে প্রক্রিয়ার অংশ। বটতলার ছাপাখানা আর দোভাষী পুথি সে আবহের মধ্যে কেবল নিচুতলার বস্তুই নয়, প্রশিক্ষণ-নিষ্ঠা-পরিশ্রমযোগে সম্পন্ন পুরনো পুথি-পরিচয় ও সম্পাদনার যে প্রতিষ্ঠিত মান, তার জন্য ক্ষতিকরও বটে। বটতলার প্রকাশনা এবং দোভাষী পুথির ভাষা — দুটোই সাহিত্যবিশারদের জন্য, অতএব, পরিত্যাজ্য হওয়ারই কথা।

৪.২

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম-নিবাসী — এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা 'মুসলমানি বাংলা'র প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলেই তাঁর রচনাবলি পাঠে প্রতীয়মান হয়। এর সাথে ক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভেদও যুক্ত হয়েছে।

মাহবুব-উল আলম (১৯৬৯: ৩৮) সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, আলাওল 'ফরিদপুরের ও আরাকানের', 'চট্টগ্রামের নহেন'। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যবিশারদ তাঁকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে জানতে চান: 'তাহা হইলে আলাওলকে চট্টগ্রামে রাখিবার কি কোন উপায় নাই?' আলাওলকে চট্টগ্রামে ধরে রাখার জন্য সাহিত্যবিশারদসহ চাটগাঁর অন্য পণ্ডিতদের মরিয়া চেষ্টা-তদবিরের কথা আমরা জানি। অন্তত সাহিত্যবিশারদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শুধু অঞ্চলপ্রীতি নয়; এর অন্য গভীরতর ঐতিহাসিক ও ভাষিক কারণ ছিল। তাঁর রচনাবলি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

সাহিত্যবিশারদের পুথির ভান্ডার গড়ে উঠেছিল মূলত চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায়* ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'প্রাচীন মুসলমান কবিগণ' প্রবন্ধে তিনি (১৯৯৭: ৪৫৬) ৮৫ জন মুসলমান কবির নাম দিয়েছেন। 'ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই

একমাত্র চট্টগ্রাম হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন।' পরবর্তীকালে আশপাশের জেলা থেকে কিছু সংখ্যক পুথি সংগ্রহ করলেও তাঁর সামগ্রিক সংগ্রহের মধ্যে চট্টগ্রামের ভাগের অনুপাত মোটামুটি একইরকম ছিল। অন্য যাঁরা মুসলমান-রচিত পুথি নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের সামগ্রিক হিসাব ধরলেও চট্টগ্রামের ভাগটা বেশ বড়ই থাকে (আবদুল করিম ১৯৯৪: ৪১)। সাহিত্যবিশারদের পুরনো সাহিত্য বিশেষত মুসলমান-রচিত সাহিত্য সম্পর্কে বেশিরভাগ ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছে এ বাস্তবতাকে অবলম্বন করে।

পরিমাণগত ব্যাপারের সাথে এখানে যুক্ত হয়েছে গুণগত ব্যাপারও। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে আলাওলই সবচেয়ে খ্যাতিমান; আর এ খ্যাতি প্রতিষ্ঠার পেছনে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অবদান একভাবে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব হলো যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি মুসলমান কবি আবির্ভূত হলেন, আর সবচেয়ে উঁচুমাপের কাব্যাদর্শও স্থাপিত হলো এ অঞ্চলেই? সাহিত্যবিশারদের কাছে এটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, মোটেই বিস্ময়কর কিছু নয়। তিনি (১৯৯৭: ৬১৬) লিখেছেন, চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছে বহু আগে — অধিকাংশ মুসলমান আরব বণিকদিগের বা তাঁহাদের সংস্রবে সমাগত আরবদিগের বংশজাত। এরাই অন্তত পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যের চর্চা করছিল — সে চর্চাই চরম উৎকর্ষ লাভ করে রোসাঙ রাজসভায় (মুহম্মদ এনামুল ও আবদুল করিম, ১৯৩৫: ৪)।

চট্টগ্রামের ভাষায় 'বিশুদ্ধ' বাংলার সংশ্রবও সাহিত্যবিশারদের কাছে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এখানকার হিন্দু জনগোষ্ঠীর কুলজি ও ভাষা প্রসঙ্গে *ইসলামাবাদ* গ্রন্থে তিনি (১৯৯৭: ৬৯) লিখেছেন:

> রাঢ় বঙ্গে মুসলমান বিপ্লব উপস্থিত হইলে হিন্দুগণের মধ্যে... অনেকেই রাঢ় ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে তথা চট্টগ্রামে চলিয়া আসেন... । মুসলমান রাজসরকারের চাকরী লইয়াও অনেক হিন্দু এদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।... চট্টগ্রামের হিন্দুগণের ভাষায় রাঢ়ের ভাষারই প্রাবল্য স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশের প্রাচীন হিন্দু কবিগণের রচিত গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, রাঢ়ের ভাষা চট্টগ্রামে যতটা অবিকৃতভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, বঙ্গের আর কুত্রাপি ততটা করিতে পারে নাই ।

এ কথার সমর্থন মেলে সাহিত্যবিশারদের জীবনী-রচয়িতা ঐতিহাসিক আবদুল করিমের (১৯৯৪: ৪১) লেখায়:

> সুলতানি আমলের পরে, বাংলার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ কররানীকে হত্যা করে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে এক মারাত্মক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়ে গৌড় সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়। সাধারণত দেখা যায় যে এই মহামারীর সময় বা গৌড় পরিত্যক্ত হওয়ার পরে এরা পূর্ববঙ্গে পালিয়ে আসে এবং চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। এই কারণেই অধিকাংশ পুথি চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়। চট্টগ্রামও এই সময় থেকে আরাকানের অধীনে চলে যায় এবং প্রায় একশত বছর চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনে থাকে। এই সময়ে কোনো কোনো কবি চট্টগ্রাম থেকে

আরাকানের রাজধানী ম্রোহং বা রোসাঙ্গে চলে যায়।

চট্টগ্রামের বড় কবি যেমন আলাওল বা দৌলত কাজী যে-ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, তা-যে কোনোক্রমেই চট্টগ্রামি আঞ্চলিক ভাষা নয়, সে কথা সাহিত্যবিশারদ বারবার বলেছেন। *ইসলামাবাদ* ও *আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* গ্রন্থে এবং বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি-যে চট্টগ্রামি ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে, আলাওল প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ কবি মোটেই চট্টগ্রামি ভাষায় কাব্যচর্চা করেননি — যে কথা কয়েকজন বটতলা-গবেষক প্রচার করেছিলেন। *ইসলামাবাদ* গ্রন্থে দেখি, তিনি (১৯৯৭: ৮৫) চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার 'অপভ্রষ্টতা', 'অদ্ভুতত্ব' কিংবা লিখিত ভাষার সাথে 'বৈষম্য' নিয়ে খুবই সচেতন; কিন্তু তাতে 'আমাদের কাহারও কিছু আসে যায় না। কারণ আমরা কেহই কথ্য ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা বা সাহিত্যালোচনা করি না এবং অন্যের সহিত কথোপকথনেও গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার করি না। সাহিত্যের ভাষা বা লেখ্য ভাষা আমাদের পৃথক এবং তাহা সকলেরই এক ও অভিন্ন।' কাজেই চট্টগ্রামি বাংলায় সাহিত্য রচিত না-হওয়ার কারণেই তাঁর সাহিত্যিক প্রকল্প চট্টগ্রামকেন্দ্রিক হতে পেরেছে।

তাহলে চট্টগ্রাম একদিকে তাঁকে দিচ্ছে মুসলমান-সাহিত্যের বিরাট ভান্ডার; অন্যদিকে সাহিত্যিক ভাষার দিক থেকে 'আদর্শ বাঙ্গালা'র দাবিও সেখানে মিটছে। পশ্চিম বাংলার মুসলমানি ভাষা ও সাহিত্য ঠিক এ জায়গাতেই তাঁর পুরো প্রকল্পে গোলমাল তৈরি করেছে। সাহিত্যবিশারদের কাছে কথিত মুসলমানি বাংলা একটি খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় বাস্তবতা — আদর্শ বাংলার সাথে সম্পর্কহীন সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যও তাঁর কাছে জঞ্জাল-বিশেষ। কাজেই তাঁর ভাষিক-সাহিত্যিক প্রকল্পে ওই বস্তুর ঠাঁই হতেই পারে না।

৪.৩

ভাষা-সাহিত্য ও গবেষণা সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সামগ্রিক ধ্যান-ধারণায় আভিজাত্য রক্ষার সুস্পষ্ট প্রকল্প ছিল। আগেই বলা হয়েছে, তিনি কলকাতার অভিজাত চর্চার সাথে উৎপাদক ও ভোক্তা হিসেবে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন। এজন্য তাঁকে নিশ্চয়ই প্রস্তুতি নিতে হয়েছে — লেখা ও গবেষণার এমন মান রপ্ত করতে হয়েছে, যেন কলকাতার চালু মানের তুলনায় তিনি নিচের সারিতে গণ্য না হন। অধিকাংশ লেখাপত্র স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয়, প্রতিবেশী কিন্তু অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে নিজ সম্প্রদায়কে যোগ্য এবং ঐতিহ্যসমৃদ্ধ হিসাবে উপস্থাপন করা তাঁর প্রধান না হোক, অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কেবল 'অন্যে'র কাছে উপস্থাপন নয়, নিজেকে অনুধাবনের ক্ষেত্রেও আভিজাত্য তাঁর কাছে সবসময়েই গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি সম্পর্কিত তাঁর মতামত সে সাক্ষ্যই বহন করে।

ইসলামাবাদ গ্রন্থে চট্টগ্রামের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সাহিত্যবিশারদ (১৯৯৭: ১৭-২১) ওই এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাদের আশরাফ শ্রেণিভুক্ত ও বিদেশাগত হিসেবে দেখবার চেষ্টা খুব স্পষ্ট। আরবদের সাথে পুরনো বাণিজ্যযোগের সূত্র ধরে তিনি চট্টলার আঞ্চলিক ভাষায় আরবি শব্দের প্রাধান্যের কথা

বলেছেন, শেখ বংশীয়দের প্রবলতাকে আরব বংশোদ্ভূতদের সাক্ষাৎ প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন; পর্দাপ্রথা, শরিয়তের কড়াকড়ি, আলেম-ওলামার সংখ্যাধিক্য এবং ধর্মপালনের আধিক্যকে তিনি আরবীয় প্রাধান্যের নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ঘটনাটি ঘটেছিল যথেষ্ট আগে; আর পঞ্চদশ শতক থেকে এ জনগোষ্ঠী বাংলায় সাহিত্যচর্চা শুরু করে। অর্থাৎ, বংশগৌরবে এবং প্রাচীনত্বে এই মুসলমান সমাজ অভিজাত আর সাহিত্যকর্মে সে আভিজাত্যেরই প্রকাশ দেখা গেছে। পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের সাথে তুলনাসূত্রে তাঁর এ অবস্থান আরো ভালোভাবে ধরা পড়ে: ‘পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ, পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে ইসলামী আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সভ্যতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে উন্নত। ইহার একমাত্র কারণ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতে আরবদের সংস্রব ছিল।’ (মুহম্মদ এনামুল ও আবদুল করিম, ১৯৩৫: ৮৮) অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গীয়রা এরকম সরাসরি ইসলামি সাহচর্য পায়নি বলেই পিছিয়ে আছে।

ভাষার ক্ষেত্রেও তাঁর অনুরূপ অবস্থানের পরিচয় মেলে। ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান’ প্রবন্ধে তিনি (১৯৯৭: ১৬১) লিখেছিলেন: ‘বাঙ্গালার মুসলমানগণের পৈতৃক জন্মভূমি যেখানেই হউক না কেন, বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া অবধি তাঁহারা খাঁটি বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছেন... । সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই বটে, বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষাও তাঁহাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষার স্থানাধিকার করিয়া এত যুগ যুগান্তর পর্যন্ত নির্বিবাদে চলিয়া আসিতেছে।’ এ বর্ণনায়ও দেখা যায়, দু-দিক থেকে তিনি আভিজাত্য রক্ষা করছেন। একদিকে বাঙালি মুসলমান বিদেশাগত — প্রচলিত এ ধারণা তিনি মেনে নিচ্ছেন; অন্যদিকে ‘বাঙালি হয়ে যাওয়া’ মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ করছেন ‘প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা’। এই প্রচলিত বাংলা — তাঁর ভাষায় ‘আদর্শ’ বাংলা — তিনি যে এত দ্রুত অনুমোদন করতে পারছেন, তার পেছনে কমপক্ষে দুটো ঘটনা কাজ করছে। এক, আলাওলের ভাষা; দুই. কলকাতায় গড়ে ওঠা প্রমিত বাংলায় বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণ, যার সফলতম নমুনা মীর মশাররফ হোসেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যৌবনে পদার্পণের আগেই বাঙালি মুসলমান কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সাধু বাংলায় প্রবেশ করে। মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ*-সিন্ধুকে বলতে পারি ওই ঐতিহাসিক ঘটনার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ, যেখানে দোভাষী পুথির জগৎ ‘মুসলমানি বাংলা’ ছেড়ে সাধু গদ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশ-যে অগ্রসর হিন্দু সমাজের সমর্থন পাচ্ছে, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছে তা অনেক বড় আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর সংশ্লিষ্ট বিপুল লেখা থেকে ‘চট্টগ্রামের সাহিত্য’ [*ভারতবর্ষ*, মাঘ, ১৩২৫] প্রবন্ধের একাংশ পড়া যাক:

> আমাদের পূর্বসূরিগণ বুঝিয়াছিলেন, আমাদের সাহিত্য শুধু আমাদের জাতির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, অন্য জাতির জন্যও তাহার দ্বার মুক্ত রাখিতে হইবে। বিজাতীয়ের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের এখন অনেক বেশী হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের সাহিত্যের ভাষা সর্বজাতি-বোধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমাদের জাতি ও ধর্মের স্বরূপ নিজের বুঝা যেমন আমাদের

> আবশ্যক, পরকে বুঝানও আমাদের কম আবশ্যক নহে। প্রধানত, অজ্ঞতাবশত বুঝিতে না পারিয়াই যে বিজাতীয়েরা আমাদিগকে মসী-বর্ণে চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার কথা নহে। মুসলমানেরা বঙ্গভাষার জন্মদাতা, মুসলমানের রক্তে-মাংসে মুসলমানের অস্থি-মজ্জায় বঙ্গভাষার দেহ গঠিত, মুসলমানের আদরে ও অনুগ্রহে তা লালিত, পালিত ও বর্ধিত। এ অবস্থায়ও বঙ্গভাষা জাতি ত্যাগ করিয়া ধর্মান্তর পরিগ্রহ করিবে, সে ভয়ে আমাদের কি বিচলিত হওয়া উচিত? বঙ্গভাষার অঙ্গে আমাদের অগণিত শব্দ ও ভাব এবং অসীম প্রভাব মিশ খাইয়া গিয়াছে। তৎসমুদয় বিচ্ছিন্ন করিতে গেলে তাহার লোম বাছিতে কম্বল শেষ হইয়া যাইবে, কুষ্ঠরোগীর ন্যায় তাহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইবে। সুতরাং অন্যের পক্ষে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য নূতন শব্দাদির আমদানী করিয়া ভাষায় জটিলতা সৃষ্টির প্রয়োজন কি? (১৯৯৭: ৫৮৫)

নিজ জনগোষ্ঠীর অতীত ঐতিহ্য আর বর্তমান সক্ষমতায় ভর দিয়ে ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রতিষ্ঠিত মোকামে অধিষ্ঠান চান আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তাতে সবসময় যে আপসের সুর বজায় থেকেছে তা নয়। গৌতম ভদ্র লক্ষ করেছেন (২০১১: ৪০), বিশ শতকের গোড়ায় *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানি* বই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যবিশারদ দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে কাতর অনুনয় করেছেন, যাতে তদীয় *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থের ভাবী সংস্করণে এ বইয়ের আলোচনা ঠাঁই পায়। কিন্তু তিন দশক পরে তিনি যখন যৌথগ্রন্থ *আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* লিখছেন, তখন পরিস্থিতির বেশ কতকটা বদল ঘটেছে। এর আগে-পরেও বহুবার, কিন্তু বিশেষভাবে এ গ্রন্থে মুসলমান-রচিত সাহিত্যে মানবীয় গুণ, মার্জিত ভাষা, ফারসি সাহিত্যের সৌরভ-সৌষ্ঠব ইত্যাদি বিচিত্র গুণকে বাংলা সাহিত্যের এমন অর্জন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা হিন্দু-রচিত সাহিত্যে অনুপস্থিত।

তার মানেই হলো, বাঙালি মুসলমানের তরফে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে সাহিত্যবিশারদ সমঝোতামূলক মিহি স্বরেই কথা বলুন আর গলার স্বর চড়া করুন, তাঁর দরকার অভিজাত অবস্থান — জনগোষ্ঠীর দিক থেকেও, ভাষা-সাহিত্যের দিক থেকেও। দোভাষী পুথি এদিক থেকে খুবই দূরবর্তী এক দুর্বল বর্গ। বটতলার উৎপাদন হিসেবে এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভাষিক-সাহিত্যিক উৎপাদন হিসেবে — দু-দিক থেকেই কলকাতার ভদ্রলোক-সমাজে এই ভাষা ও সাহিত্য ছিল সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য (Ghosh, 2006, গৌতম, ২০১১; সুমন্ত, ২০১৩: অদ্রীশ, ২০০০)। কোনো কারণে এ সাহিত্যধারা যদি মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল চর্চা হিসেবে গণ্য হতে থাকে, তাহলে আভিজাত্যের সমূহ ক্ষতি। মোটেই বিস্ময়কর নয়, সাহিত্যবিশারদ শুধু যে নিজে এ ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেননি তা নয়, অন্য যে কারো চর্চাকেও সর্বতোভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন।

৪.৪

উনিশ শতকের শেষাংশে — আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বেড়ে ওঠার কালে — বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নব-উদ্ভূত নগণ্য-সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের

জন্য একপ্রকার সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশশ বিশের দশকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দাঙ্গা ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা বেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি ও সহানুভূতির নানা নজির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩- ১৯৩১), দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯), বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) প্রমুখ এ দৃষ্টিভঙ্গির ভালো প্রতিনিধি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উনিশশ দশের দশকের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে লেখা বহু-উদ্ধৃত প্রবন্ধগুলো, এবং ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলো এ সময়ের প্রতিনিধিত্বশীল রচনা; চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ও সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) চিহ্নিত হতে পারেন রাজনৈতিক প্রতিনিধি আর অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের যৌথতা ও বেঙ্গল প্যাক্টকে বলা যেতে পারে সমধর্মী রাজনৈতিক কর্মসূচির বহিঃপ্রকাশ। মুসলমান-সমাজ সংখ্যাগুরুর রাজনীতিতে প্রবেশ করার আগের দশকগুলোতে বিকশিত 'বাঙালি' 'ও 'ভারতীয়' জাতীয়তাবাদ এবং 'অসাম্প্রদায়িক' সমন্বয়বাদের ওই যুগেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মানস-গঠন হয়েছিল। তাঁর নিজের জীবনে এ আবহের যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়।

মাহবুব-উল আলম (১৯৬৯: ৩৪) জানাচ্ছেন, 'উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বাসভূমি রূপে পটিয়া থানা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল... পটিয়ার হিন্দুরা ১৮৪৫ সালেই চট্টগ্রাম শহরের বাইরে পল্লী অঞ্চলে প্রথম ইংরাজী স্কুল স্থাপন করে। আবদুল করিম এই স্কুলের প্রথম মুসলমান পড়ুয়া।' এ স্কুলেই তিনি সংস্কৃত পড়েছিলেন, মুহম্মদ এনামুল হক (১৯৬৯: ৬৯) যদিও বলেছেন 'প্রতিবেশী হিন্দুকে চেনার তাগিদে, কিন্তু আসলে স্কুলে বিকল্প ছিল না বলে (আহমদ শরীফ, ১৯৮৭: ১৪)। কারণ যাই হোক, এটা আসলে একটা পরিস্থিতি, যখন কোনো কোনো মুসলমান তরুণ সংস্কৃত পড়ত, যেমন পড়েছিলেন দেশের অন্যপ্রান্তে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং শহীদুল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে যেমন, ঠিক সাহিত্যবিশারদের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত অধ্যয়ন খুব কাজের হয়েছিল। লেখালেখি শুরুর অল্পদিন পরেই কবি ও সরকারি চাকুরে নবীনচন্দ্র সেনের আনুকূল্য পান তিনি। 'এই সময় থেকে নবীনচন্দ্র তাঁর friend. philosopher and guide। নবীনবাবুর মত সাহিত্য-রথীর সহানুভূতি বহুদিন ছিল তাঁর জীবন পথের পাথেয়।' (মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্, ১৯৬৯: ৪৩) আনোয়ারানিবাসী রাজচন্দ্র সেন কালিক প্রথা ভেঙে তাঁকে মধ্য ইংরেজি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন, যে চাকরিকালকে তিনি নিজে তাঁর স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করতেন (আহমদ শরীফ, ১৯৮৭: ১৬)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাথে তাঁর আমৃত্যু সংযুক্তিকে যদি সুযোগ বা আনুকূল্য হিসেবে বিবেচনা নাও করা হয়, ওই বিশেষ সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার লক্ষণ হিসেবে গ্রাহ্য তো করতেই হবে ।

আসলে প্রসঙ্গটা ঠিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সহানুভূতিরও নয়। যুগের প্রধান হাওয়টাই ছিল এরকম। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অধিকাংশ জীবনীকার ও ভাষ্যকার ব্যাপারগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন তাঁর ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বা ভাবাদর্শিক 'প্রগতি'র কারণে এরকম ঘটেছে। আসলে মোটেই তা নয়। ওই প্রজন্মে বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করলেই বোঝা যাবে, সমন্বয়বাদিতাই প্রধান যুগধর্ম। শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী (১৮৫৯-

১৯১৮), মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬১-১৯৩৩), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) প্রমুখ এ যুগের প্রতিনিধি ।

এঁদের অনেকেই সমন্বয়বাদী ছিলেন — বস্তুত অধিকাংশ; আর কয়েকজন ছিলেন রীতিমতো জাতীয়তাবাদী-কংগ্রেসি। সবাই পত্র-পত্রিকা বের করেছেন। স্বজাতির কল্যাণ কামনায় কাজ করেছেন। এ স্বজাতি মুখ্যত বাঙালি মুসলমান; আর প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অগ্রসর বাঙালি হিন্দুর সাথে ঐক্যের মেজাজই প্রধান ছিল। ব্যতিক্রমহীনভাবে সবাই বাংলায় লিখেছেন। আর এঁদের সবার বাংলা প্রমিত; অনেকেরই বঙ্কিমীয় ও রাবীন্দ্রিক — তৎসমবহুল । এক কথায় একে বলা যায় সমন্বয়ধর্মী বাংলা, বাঙালি মুসলমানের তরফে যে বাংলার প্রবর্তন করেছিলেন বস্তুত মীর মশাররফ হোসেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মোটের উপর এ আবহই রক্ষা করে চলেছেন শেষ পর্যন্ত। তাই তিনি মুসলমানি সাহিত্যচর্চার এলাকায় এমন একটি ঝোঁককেও প্রশ্রয় দিতে চাননি, যা তাঁর সময়ের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান ঐক্যকে চাপে ফেলে দেবে। এটাই আরবি-ফারসি শব্দের অতিরেক ভাষায় আমদানি করার বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল আপত্তির পটভূমি। কারণ, তা ভাষার ‘বিশুদ্ধ’ ও ‘সমন্বিত’ রূপের হানি ঘটাবে। দোভাষী পুথির কোনো ভাষারূপ এ কারণেই তাঁর অনুমোদন পেতে পারে না।

৫

‘আধুনিক’ বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রথমদিকের প্রজন্মের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। পুরনো সাহিত্যের সংগ্রহ-সম্পাদনা ও পরিচিতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি পরবর্তী বহু প্রজন্মের সমসাময়িক হয়ে থাকার বন্দোবস্ত করেছেন। ভাষ্যকারেরা বলছেন, পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি দুটি বই এবং ছয় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আর দশজনের মতো তিনিও সমকালের প্রভাবশালী ডিসকোর্সের অধীনেই কাজ করেছেন, এবং কখনো কখনো নিশ্চয়ই অবদমিত ডিসকোর্সকেও তুলে এনেছেন। কালের খতিয়ান আমলে না এনে তাঁর রচনাবলি ও তৎপরতার পাঠ কোনোক্রমেই সুফলদায়ক হতে পারে না। পরবর্তীকালের প্রভাবশালী ডিসকোর্সকে পুরনো জমানায় আরোপ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না: কালাতিক্রমী দোষ ঘটবে কেবল। সাহিত্যবিশারদের ক্ষেত্রে এ ধরনের পাঠের প্রবলতা আছে; এবং সাধারণত ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদী’, ‘অসাম্প্রদায়িক’, ‘প্রগতিশীল’ ইত্যাদি বর্গের অধীনে আরোপণমূলক কায়দায় তাঁকে পাঠ করার প্রবণতা খুবই বেশি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছি, যতটা ভাবা হয়, ব্যাপারটা আসলে তারচেয়ে জটিল।

চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্য এবং বিশেষত আলাওলের সাহিত্যকর্ম নিয়ে সাহিত্যবিশারদের সাহিত্যচিন্তার যে জগত গড়ে উঠেছিল, হাল আমলের গবেষণায় তার গ্রহণযোগ্যতা কমেছে। থিবো দুবের (d’Hubert 2018) দেখিয়েছেন, আলাওলের সাহিত্যকর্মের সাথে

চট্টগ্রাম, বা বাংলা অঞ্চল বা বাঙালি পরিচয়ের সম্পর্ক তুলনামূলক গৌণ; বরং একটি কসমোপলিটন সমুদ্র-বাণিজ্য, বহুজাতি-সমাবেশ, আর সংস্কৃত ও ফারসিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির বিশেষ গড়ন অবলম্বন করলে আলাওল তথা রোসাঙ অমাত্যসভাকে অনেক ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যেমন সম্ভব আলাওলসহ অন্যদের কাব্যনন্দন বিশ্লেষণ করা। অন্যদিকে, দোভাষী পুথি নিয়ে সাহিত্যবিশারদের 'অনুদার' দৃষ্টিভঙ্গিও যথার্থ প্রমাণিত হয়নি। খুব উষ্ণ অভ্যর্থনা না জানালেও এ সাহিত্যধারা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন সুকুমার সেন, আনিসুজ্জামান, কাজী আবদুল মান্নান, আহমদ শরীফ, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুমসহ অন্য অনেকে । আর বটতলা ও দোভাষী নিয়ে পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ইদানীং রচিত হয়েছে অনেকগুলো নতুন ধারার সন্দর্ভ (Ghosh, 2006; সুমন্ত, ২০১৩; অদ্রীশ, ২০০০: মোহাম্মদ আজম, ২০২২)। তবু সাহিত্যবিশারদের ভাষা ও সাহিত্যদৃষ্টির নিরিখে দোভাষী সাহিত্যধারার মূল্যায়ন তাৎপর্যবহ; কারণ, এর মধ্য দিয়ে বিশেষ ইতিহাসদৃষ্টি এবং ইতিহাসের বিশেষ কালপর্বের পর্যালোচনা সম্ভব।

আমরা দেখিয়েছি, 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদী প্রবণতায় সাহিত্যবিশারদকে পাঠ করা সম্ভব; আর সেক্ষেত্রে দোভাষী পুথি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সাহিত্যবিশারদের সামগ্রিক আত্মসত্তার চিহ্নায়নে বাঙালি মুসলমান বা মুসলমান পরিচয়ও খুবই গভীর ও কার্যকরভাবে উপস্থিত। সেক্ষেত্রে দোভাষী পুথির প্রতি তাঁর প্রবল বিরাগ বা বিতৃষ্ণার ব্যাখ্যা এতটা সহজ হয় না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, এক. কলকাতায় বিকশিত পুরনো পুথি সম্পাদনা ও প্রকাশের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি এ দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম উৎস; দুই. চট্টগ্রাম তথা পূর্ববঙ্গনিবাসী হওয়াটা একেবারে ঐতিহাসিক কারণেই সাহিত্যবিশারদের সংশ্লিষ্ট অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করেছে; তিন. তৎকালীন মুসলমান এলিটের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ চিহ্ন বহন করে তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি, এবং চার. সমকালীন উদারনীতিবাদী ও সম্প্রদায়-সমন্বয়ের চালু কায়দা-কেতাগুলো দোভাষী পুথি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে

দোভাষী পুথি সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা এভাবে তাঁকে এবং তাঁর কালকে বিশ্লেষণধর্মী কায়দায় বুঝতে সাহায্য করে।

সহায়কপঞ্জি

অদ্রীশ বিশ্বাস (সম্পাদক), ২০০০। *বটতলার বই* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, গাঙচিল, কলকাতা।

আবদুল করিম, ১৯৯৪। *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: জীবন ও কর্ম,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ১৯৯৪। 'প্রাচীন মুসলিম বঙ্গ-সাহিত্য', ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত

নির্বাচিত রচনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'জ্ঞানপ্রদীপ', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল*

করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'দৌলত উজীর ও লায়লা মজনু', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'প্রাচীন মুসলমান কবিগণ', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'চট্টগ্রামের মুসলমান', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'আলাওল-চরিত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। ''মুসলমানী বাঙ্গালা' কি?', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১মখণ্ড,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'বাঙ্গলার প্রাচীন মুসলমান কবি', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'চট্টগ্রামের সাহিত্য', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড,* বাংলা একাডেমি।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৯৭। 'রোসাঙ্গ রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল হক, ১৯৬৯। 'সাহিত্যবিশারদ স্মরণে', মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক গ্রন্থ,* বাঙ্‌লা একাডেমী: বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

আবদুল হক চৌধুরী, ১৯৯৪। 'সাহিত্যবিশারদ স্মৃতি ও তাঁর পত্রাবলি', ফরহাদ খান ও মোঃ সৈয়দুর রহমান সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে নিবেদিত প্রবন্ধসংকলন,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবুল আহসান চৌধুরী [সম্পাদক], ২০১১। *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: ঐতিহ্য-অন্বেষার প্রাজ্ঞ পুরুষ,* শোভা প্রকাশ, ঢাকা ।

আশরাফ সিদ্দিকী, ২০১১। 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: ঐতিহ্য-অন্বেষার প্রাজ্ঞ পুরুষ,* শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

আহমদ শরীফ, ১৯৬৯। 'সাহিত্য-বিশারদ', মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক গ্রন্থ,* বাংলা একাডেমী: বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

আহমদ শরীফ, ১৯৮৭। *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গৌতম ভদ্র, ২০১১। *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?,* ছাতিম বুক্‌স্‌, কলকাতা।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ১৯৯৪। 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ', ফরহাদ খান ও মোঃ সৈয়দুর রহমান সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে নিবেদিত প্রবন্ধসংকলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মাহবুব-উল আলম, ১৯৬৯। 'আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ', মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক গ্রন্থ*, বাঙ্‌লা একাডেমী: বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৩৫। *আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য* [খ্রীষ্টীয় ১৬০০-১৭০০ অব্দ], গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।

মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৬৯। 'আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ', মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক গ্রন্থ*, বাঙ্‌লা একাডেমী: বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার, ১৯৬৯। 'মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ', মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক গ্রন্থ*, বাঙ্‌লা একাডেমী: বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম, ২০২২। 'দোভাষী-রীতির রচনা", মোহাম্মদ আজম সম্পাদিত *তত্ত্বতালাশ*, পঞ্চম সংখ্যা, আদর্শ, ঢাকা।

মোহাম্মদ ইদরিস আলী, ১৯৬৯। 'সাহিত্য-বিশারদ আবদুল করিমের সাহিত্য-সাধনা', মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক গ্রন্থ*, বাঙ্‌লা একাডেমী: বর্ধমান হাউস, ঢাকা ।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩। *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, অনুষ্টুপ, কলকাতা।

Chatterji, Suniti Kumar, 2002 [1926]. *The* Origin and Development *of the* Bengali Language, Third Impression. Rupa & Co, New Delhi.

Ghosh, Anindita, 2006. Power in *Print*: Popular *Publishing* and *the Politics* of Language and *Culture* in a Colonial Society, *1778-1905*, Oxford University Press, New Delhi.

d'Hubert, Thibaut, 2018. *In the Shade of the Golden Palace: Alaol and Middle Bengali Poetics in Arakan*. Oxford University Press, New York.